**মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি**
**মোরা একটি হাসির জন্যে অস্ ধরি.....**
**১৯৭১ , শরণার্থী ক্যাম্পের দিনগুলো**
**সদেরা সুজন**

১৯৭১ সালে বয়স কতইবা হবে। সাত কিংবা আট। বলতে গেলে শৈশবের চঞ্চলতা। বিহঙ্গের মতো চষে বেড়াতাম গ্রামের এ বাড়ি থেকে ওবাড়ি, স্কুল-লেখাপড়া, খেলাধুলা, দুরন্পনা আর গ্রামের অন্যান্য সমবয়সী শিশুদের সঙ্গে মারামারি হানাহানি করেই যা"ছিল সময়। বাঁদর আর সাপ নাচ দেখার জন্য জেলাবোর্ডের রাস্তার ওপর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম খাওয়া-নাওয়া ভুলে, কখনো সাপুড়ীর সাপের খেলা কখনো বাঁদর নাচ দেখে বাড়িতে ফিরতাম, স্কুল থেকে ফেরার পথে সহপাঠীরা রেল গেইটে দাঁড়িয়ে থাকতাম কোনো ট্রেনের অপেক্ষায়, কখনো ঢাকা সিলেটগামী উল্কা কিংবা মালবাহী ট্রেনের নিচে পয়সা রেখে দিতাম আর সেই পয়সার উপর দিয়ে ট্রেনটি চলে যেত, দুরে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতাম পয়সাটা কি করে মুহূর্তে চ্যাপ্টা হয়ে যায়, ট্রেন চলে যাবার পর সেই গরম চ্যাপ্টা পয়সা নিয়ে খেলা করতাম, রেলগেইটের পাশের বিশাল আম গাছ থেকে রেল লাইনের পাথর ছুঁরে কাছা আম পাড়া, গাছের ওপর থেকে পাখির বাসা ভেঙ্গে পাখির বা"চা নিয়ে খেলা করা, সাইকেল বগলমেরে চালানো, আখ ক্ষেত থেকে আখ ভেঙ্গে খাওয়া, রেমান চাচার দোকান থেকে বাবার নাম বলে বাকীতে এক আনার বিস্কুট কিংবা লজেন্স কিনে খাওয়া, পেয়ারা গাছ থেকে পেয়ারা খাওয়াসহ এরকমের কত কিছু নিয়ে সময় যা"ছিল। রাজনীতির কিছুই বুঝিনি তখোন। হঠাৎ করেই যেন চারদিকে যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। মিছিল মিটিং আর ভয়ে কম্পমান সময়। বড়দের মুখ ছিলো ঈশানকোনের মেঘের মতো কালো। কারো কাছে কোন প্রশ্ন করা ছিল নিষিদ্ধ। তাঁরা নিজেরাই ছিলেন বিমর্ষ, ভয়ে ভীত। শমসের নগরে বিমান বন্দরে পাক বাহিনীর অসংখ্য বোমা নিক্ষেপই আমাকে জানিয়ে দিল দেশে ভয়াবহ যুদ্ধ লেগেছে। আমরা তখন বাড়ির সামনে খেলছিলাম। কি বিকট শব্দে প্রকম্পিত হয়েছিলো বোমাগুলো। সঙ্গে সঙ্গে সারা গ্রামে কান্নার রোল শোনা যা"ছিল, সকলেই ভয়ে কাঁদা শুর" করেছিল। কারণ তখন গ্রামের অধিকাংশ বাড়ির পুর"ষরাই বাড়িতে ছিলেন না। যুদ্ধ বলতে কী জিনিষ এর আগে কখনো দেখিনি, ফলে যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব আমার কাছে তখন খারাপ লাগেনি, কারণ হঠাৎই স্কুল বন্ধ হয়ে গেল, লেখাপড়া নেই, বড়দের ধমক নেই, ঘুমঘুম চোখে কবিতা মুখস্ করতে হবে না কিংবা বাবার হাতে জালিবেতের মারও খেতে হবে না। বলতে গেলে মুক্ত ও স্বাধীন। যুদ্ধের ভয়াবহতা আর যুদ্ধে যে এত মানুষ মরে, সেটাতো জানতামই না। সত্যি কথা বলতে কি তখনো সঠিকভাবে বুঝতে পারিনি সেটা কিসের যুদ্ধ কিংবা কার সাথে যুদ্ধ? জয় বাংলা শ্লোগান আর শেখ মুজিবের নাম তখন হয়তো শুনেনি কিংবা মুখস্ হয়নি এমন শিশু খুব কমই পাওয়া যাবে। সেই সময়ের একটি গান

আজো ভুলতে পারছি না, যে গান আমার মনভোলা জীবনে কতবার গেয়েছি, এখনো মন খারাপ হলে উদাস কণ্ঠে সেই গানটি গাই, এখনো এই প্রবাসের কষ্টকঠিন সময়ের ফাঁকে ফাঁকে কর্মস্থলে এই গানটি গাই, যদিও অনেক লাইন ভুলে গিয়েছি, ভিনদেশী মানুষরা জিজ্ঞেস করে আমি কি গান গা"ছি? আমি বলি হাঁ, আর সেটা আমার ভাষায় আমার হৃদয়ের পংক্তিমালা। যে পংক্তিমালা আমাকে সাহস যুগিয়েছে, যে পংক্তিমালা আমাকে একটি ঠিকানা দিয়েছে, যে পংক্তিমালা আমাকে আমার পরিচয় দিয়েছে, যে পংক্তিমালা আমাকে একটি স্বাধীন স্বার্বভৌমত্ত দেশ দিয়েছে বিশ্বের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, যে পংক্তিমালা মিশে আছে আমার রক্তে রক্তে, যে পংক্তিমালা আমাকে বাঁচার প্রেরণা দিয়েছে, যে পংক্তিমালা আমার শৈশব জীবনের চোখ খুলে বুঝতে শিখিয়েছে, যে পংক্তিমালা আমাকে এই উন্নত দেশে আসার সুযোগ করে দিয়েছে। শুধু কী আমি, স্বাধীনতা সংগ্রামের পুর্ব থেকে সেই গানটি অজস্র মানুষের মুখে মুখে সুরে সুরে ধ্বণিত হয়েছে, বিশেষ করে রাখালের কণ্ঠে মেঠোপথে গর"র পাল নিয়ে যেতে যেতে সেই আবেগ আর প্রাণের ছোঁয়া গানের কলি মুখরিত হয়েছে 'মুজিব বাইয়া যাওরে/ নির্যাতিত দেশের মাঝে/ জনগণের না-ও ওরে মুজিব/ বাইয়া যাওরে/ ও মুজিব রে/ আকাশ কান্দে, বাতাস কান্দে/ কান্দেরে বাঙালী.../ সাতকোটি বাঙালীর মাঝে তুমি হয়লায় নেতা-রে, মু জি বি, বাইয়া যাওরে।' বড় ভাইর মুখে আর গ্রামের মানুষের মুখে মুখে তখোন বঙ্গবন্ধুর কত গল্প যে শুনতাম। আমরা খেলার ছলে কতো হাজারবার যে জয় বাংলা শ্লোগান দিয়েছি তার কোন হিসেব নেই। গ্রামের ১০/১২ জন শিশুকে নিয়ে আমরা মিছিল করতাম বড়দের মতো 'জ..য় বা..ং..লা' 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা' 'তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব' বলে। পুরানো সবুজ কাপড়ের মধ্যে লাল রংগের কাপড় গোল করে কেটে সুঁচ দিয়ে সেলাই করে লাল কাপড়ের মধ্যে কাঁচা হলুদ দিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র এঁকে পতাকা বানাতাম আর সেই পতাকা বাঁশের সিংলার মধ্যে সেপ্টিন দিয়ে গেঁথে আমরা মিছিল করতাম আকাশপানে হাত তুলে 'জ য় বা ং লা' বলে। এই মিছিলের কারণ কি তাও সঠিকভাবে বুঝতাম না। বাংলাদেশের নতুন পতাকা আমাদের বাড়িতে ছিল। আমার বড় ভাই ছাত্রলীগের কর্মী পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধা হওয়াতে এই পতাকাটি সাইকেলের সামনে লাগিয়ে বিভিন্ন জায়গা ঘুরতেন কখনোবা মুলি বাঁশের উপরে লাগিয়ে বাড়ির সামনে রেখে দিতেন, আর বাতাসে তা ফতফত করে উড়তো তা আমরা মুগ্ধ হয়ে তন্ময়ে চেয়ে থাকতাম। এ নিয়ে গ্রামের মানুষের যে কত কথা শুনতে হয়েছে। অবশ্য এটার কারণ গ্রামের মানুষ ছিলো ভয়ে ভীত। আমাদের বাড়ির পাশ্বেই ছিলো রেল লাইন, সেখানে দেখেছি ছোট বড় ব্রিজের মধ্যে রাজাকারদের টহল, পথচারীদেরকে দাঁড় করিয়ে প্রশ্নবান আর তল্লাশি আবার কোন কোন সময় নির্যাতনও করতে দেখা যেত, তবে নির্যাতনের শিকার হতো হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক বেশী। রাতে টচ্ লাইটের আলো আমাদের বাড়িতে এসে পরতো কখনো কখনো গুলির

শব্দ শোনা যেত ফলে সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ঘরের সমস্ হারিকেন নিভু নিভু করে নিঃশব্দে আতঙ্কে থাকতে হতো কোন সময় না-কি কি হয়ে যায়। রাতে গুলির শব্দে আতংকে থর থর কাঁপতাম। গ্রামের বড়রা মাঝে মধ্যে খুব নীচু গলায় বাবাকে ডাকতে শুনেছি, বাবাও পরিচিত গলা বুঝলে দরোজা খুলে দিতেন এবং একসঙ্গে তখন তাঁরা খুবই কম সাউন্ডে বিবিসি শোনতেন। এদিকে আমাদের এলাকার সর্বত্র পাক জানোয়াররা সাঁজোয়া বহর নিয়ে প্রদক্ষিণ করছে, স্থানীয় রাজাকার আলবদর আর শান্তি বাহিনীর হায়েনারা প্রতিটি গ্রাম চষে বেড়াচ্ছে, প্রতিদিনই কোন না কোন গ্রামের মানুষকে পাক জানোয়াররা হত্যা করছে, এলাকার সর্বত্র পাকি সৈনিক আর রাজাকারদের বর্বরতার সংবাদ পাওয়া যেত ফলে গ্রামের মানুষ সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে বিশেষ করে ভারতের দিকে চলে যাচ্ছে জীবন বাঁচাতে। আমাদের গ্রামেরও প্রায় সবাই ভারতে চলে যায় একমাত্র আমরা আর পাশের বাড়ীর দু'টি পরিবার ছাড়া, কিন্তু না, বেশীদিন থাকা সম্ভব হয়নি ২/৩ দিন পরই আমাদের এক আত্মীয়কে আমাদের বাড়ি থেকে তাঁর নিজ বাড়িতে ফেরার পথে স্থানীয় কুখ্যাত রাজাকারের সহযোগিতায় পাকি সৈনিকরা হত্যা করে রাস্তায় ফেলে রাখে, ফলে বাবা আর স্থির থাকতে পারেননি। সেই রাতগভীরে শত বর্ষের স্মৃতিঘেরা বাড়ির সব কিছু ফেলেই ভারতের উদ্দেশ্যে ঠিকানাবিহীন গন্ব্যে আমরা রওয়ানা হই। কষ্ট-বেদনাকে নিত্যসঙ্গী করেই উদ্বাস্তু জীবনের যাত্রা হয়। বাড়িতে শুধু বাবা রয়ে যান। অন্ধাকারা"ছন্ন রাতে ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর শিয়ালের ডাক শোনে শোনে আমরা সবাই ধানক্ষেতের সর" আইল ধরে পিপিলিকার মত চা বাগানের আঁকা বাঁকা উচু নিচু সর" পথে নিরবে প্রায় ৮/১০ ঘন্টা হেঁটে ভারতে পৌঁছি। পথে ঘাটে ঘাটে কত ভয় আর শংকা নিয়ে যেতে হয়েছে। পাহাড় আর ছোট ছোট টিলার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে শরীর শির শির করছিল ভয়ে আর আতংকে। আমার কাছে তখন যুদ্ধের ভয়ের চেয়ে বেশি ভয় ছিলো ভুত-প্রেত-দৈত্য-দানব- বিষধর সাপ আর শিয়ালের। সম্পূর্ণ পরিবেশটা আমার কাছে ছিলো ভৌতিক, একটি শব্দ হলেই শিউরে উঠতাম আর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমাদের সঙ্গী শিশির কাকাকে ঝাপ্টে ধরতাম। আমাদের দলে মোট ২৫/৩০ জন পুর"ষ মহিলা আর শিশু কিশোর ছিলো। লাইনের সামনে ও পিছনে ছিলো টর্স লাইট হাতে পুর"ষরা আর মধ্যখানে সব নারী আর শিশুরা। ছোট বড় সবার হাতেই ব্যাগ নতুবা পুটলী ছিলো যার মধ্যে সামান্য খাদ্য চিঁড়া-মুরি কিংবা কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কাপড়-চোপড়।

দীর্ঘ পথ হেঁটে হেঁটে আমরা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে যখন ভারতের সীমান্ত নদীটি পেরিয়ে কৈলাশহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই তখন সুর্যের উদ্ভাসিত আলোয় পৃথিবী আলোকিত করেছে। আমাদের এই বিশাল দলটি কৈলাশহরের বিশ্বাস বাবুর বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। বিশ্বাস বাবু আমাদের এই বিশাল দলকে ফিরিয়ে দেননি, বরং হৃদয়ভরা

ভালোবাসা দিয়ে আশ্রয় দিয়েছেন তাঁর সীমিত বাড়িতে। বিশ্বাস বাবু আমাদের এলাকারই মানুষ ছিলেন। বড়দের মুখ থেকে শুনেছি বহু বছর আগে বিশ্বাস বাবুর বাবা ভারতের কৈলাশহরে বিনিময় করে চলে যান আর আমাদের এলাকায় সিকন্দর চাচা তার বাড়িতে চলে আসেন। যাক্ সেদিন ভারতের ঘরে ঘরে ছিলো যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের মানুষের ভীর, একটু জীবন বাঁচানোর মিনতি, একটু আশ্রয়, একটু খাদ্য, একটু বাসস্থান। না, ভারতবাসী ফিরিয়ে দেয়নি। সোয়া কোটি মানুষকে খাদ্য আর আশ্রয় দিয়েছিলো মানবতা আর মুণিষ্যত্যের ডাকে। বিশেষ করে ত্রিপুরার কৈলাশহরে দেখেছি ভারতের মানুষ কি অকৃপণভাবে বাংলাদেশের মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিল, প্রত্যেক বাড়িতেই 'জয় বাংলা'র লোকে তিল ধারনের ঠাঁই নেই। গোয়াল ঘর থেকে শোবার ঘর, বাড়ির আঙ্গিনা থেকে উঠোনে তেরপাল কিংবা চাচ টাঙ্গিয়েও মানুষের সেই বিশাল দলকে আশ্রয় দিয়েছিল। যেমনিভাবে বিশ্বাসবাবু আমাদেরকে দিয়েছিলেন।

সেদিন দেখেছি শরণার্থী শব্দটির সঙ্গে মিশে ছিলো কর"ণাঘন এক মানবিক নিঃশব্দ কান্না, যে কান্না আর যন্ণার স্মৃতি তেত্রিশ বছর পর আজো ভুলতে পারছি না। মনে পড়ে আজো সেই দুঃসহ দুর্দিনে দিনগুলোর কথা।

কৈলাশহর থেকে প্রায় ৬/৭ মাইল দুরে ছিল একটি বড় ক্যাম্প্স শ্রীনাথপুর। বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে ৩/৪ মাইল দুরে। কৈলাশহরের ছোট ছোট পাহাড়-টিলা বেষ্টিত সবুজ বনানীঘেরা আঁকা বাঁকা কাচা পথ হেঁটে যেতে হত সেই ক্যাম্প্স। ক্যাম্প্সের ঘরগুলো ছিলো ঠিক স্কুল ঘরের মতো কিন্তু বিশাল এলাকা জুড়ে একই রকমের শত শত লাইনের ঘর ছিলো। একেকটা লম্বা ঘরকে মধ্যে পার্টিশন দিয়ে ৭/৮ টি পরিবার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমার মনে হয় শ্রীনাথপুর ক্যাম্প্সই শুধু ১৫/২০ হাজার শরণার্থী ছিল। ক্যাম্প্সের পাশ্বেই ছিল একটি ছোট চা বাগান ও ছোট ছোট বস্তি। বস্তিবাসী ও বাগানের শ্রমিকরা আর ক্যাম্প্সের শরণার্থী মিলে এলাকার জনসংখ্যা হয়েছিল বিশাল।

আমাদের আট জনের পরিবারের জন্যে দেওয়া হয়েছিল একটি ঘর। সেখানে দুটি মেচাঙ্গ বেঁধে আমরা ৭জন থাকতে হতো। বড়ভাই চলে যান মুক্তিযুদ্ধে ফলে প্রথমে কিছুদিন মাঝেমধ্যে ট্রেনিং ক্যাম্প্স থেকে সকালে এসে আমাদেরকে দেখে খুঁজখবর নিয়ে আবার বিকেলে চলে যেতেন। এরপর টানা ক'মাস আমরা ভড়ভাইকে দেখিনি। তিনি তখন মুজিব বাহিনীর একজন সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা হয়ে দেশের ভিতরে অবস্থান করছিলেন।

প্রথমে ক্যাম্পের পরিবেশটা আমার কাছে খুব খারাপ লেগেছিলো। সব সময় যেন ভয় ভয় করতো। একা একা ভীষণ নিঃসঙ্গ ভিষন্ন লাগতো। লেখাপড়া-খেলাধুলা কিছুই করা সম্ভব হতো না। শুধুই বাড়ির কথা মনে পরতো আর কান্না আসতো। গ্রামের সমবয়সীরা পাশ্বে নেই বলে ওদের কথা মনে হলেই কান্না বেড়ে যেত। না বেশী দিন যায় নি বেশ ক'জন সঙ্গী জোটিয়ে নিলাম। অনেকের বাড়িই আমাদের এলাকায় নয়, তা হলে কি হলো? তখোনতো আমরা সবাই এক ও অভিন্ন সবাই আত্মার আত্মীয়, ধনী-গরিব, জাত-ধর্ম কিছুই ছিলো না মনের মাঝে। সেখানে রান্না ঘর আর থাকার ঘরে যাওয়া আসায় কোন বাধ্য-বাধকতা কিংবা কোন কুসংসার ছিলো না। শ্রীনাথপুর ক্যাম্পে গিয়ে অনেক বন্ধু জোটেছিল তাদের অনেকের নাম এখন মনে নেই, কারণ একটাই তেত্রিশটি বছর পার হয়ে গেছে, আর এই তেত্রিশ বছরে জীবনের অনেক উত্থান পতন ঘটেছে। এই তেত্রিশ বছরের মধ্যে ক্যাম্পের তিন বন্ধু সন্দেশ ও অর"ন (কমলগঞ্জ) আর করিম ( বাবা শহীদ হওয়াতে মা আর মামার সঙ্গে সম্ভবত নবিগঞ্জ থেকে ক্যাম্পে এসেছিলো) দু'বার দেখা হয়েছে। বাকী বন্ধু চিন্ময়, অবনী, ভাস্কর দাদা, বাপ্পু, রঞ্জন, পাবলু, শহীদ, সুমন, মিলিসহ অনেকের সঙ্গেই আর কোনদিন দেখা হয়নি, জীবিতকালে আর দেখা হবে বলে বিশ্বাস করি না, কারণ কে কোথায় আছে কেমন আছে জানিনা। আর আমিতো এখনো এক পথহীন দেশছাড়া সুদুর প্রবাসে স্বে"ছায় নির্বাসনে। যতই আমার হৃদয় কাঁদুক মা-দেশ-মাটি- আর স্বজনমানুষের জন্যে, জানি তবুও আর কোন দিন ফিরে যাওয়া যাবে না। যদিও যাই, যাবো প্রাণহীন দেহ, নিরভ অভিমানে।.....আমরা ক্যাম্পের লাইনে লাইনে দিন-দুপুর সকাল-সন্ধ্যা ঘুরতাম। কে কত নম্বর লাইনের ঘরে থাকতো তা হয়তো আমরা অনেকেই জানতাম না কিন্তু প্রতিদিন সকালে আমরা ক্যাম্পের পাশেই বড় ঘরের ( চা শ্রমিকদের মন্ডপে) সামনে সমবেত হতাম, চষে বেড়াতাম সারা ক্যাম্প। এই শরণার্থী ক্যাম্পের পাশ্বেই সম্ভবত ছিলো একটি মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং সেন্টার। ছিল ভারতের আর্মীদের বিশাল দু'টি ক্যাম্প, সেখান থেকেই ভয়ার্ত চোখে দেখেছি বড় বড় কামান আর মর্টার-সেলিং নিক্ষেপ করে বাংলাদেশ বিরোধী শত্র"পক্ষকে আক্রমন করতে। ভারতীয় আর্মীরা যখন মর্টার সেলিং নিক্ষেপ করতো তখন ভাবতাম তারা কি করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থানে নিক্ষেপ করতে পারে! আমরা সেখানে গিয়ে তাদের মর্টার আর সেলিং নিক্ষেপের দৃশ্য দেখতাম। আমাদেরকে আর্মী ক্যাম্পের ভিতরে যেতে না দিলেও ভারতীয় আর্মীরা আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতো না, অনেকেই আমাদেরকে আদর করতো। তাদের খাবার 'বিশাল আকৃতি'র র"টি আর সবজি ভাঁজি খেতে দিত। এত বড় র"টি আমি এর পুর্বে আর কখনো দেখিনি। একটি সম্পূর্ণ র"টি আমি একা কখনোই খেতে পারিনি। আমরা সারাদিনব্যাপি কত রকমের খেলায় মত্ত থাকতাম আর তখন মনে হতো আমরা সেখানেই জন্মগ্রহণ করে বড় হয়ে উঠছি, যত দিন যা"ছিল এলাকাটা আমাদের কাছে ভীষণ

আপন ও পরিচিত মনে হ'ছিল। বাড়ির কথাও ভুলে যা'ছিলাম এক এক করে। নতুন নতুন সমবয়সী বন্ধুদের সংখ্যাও বেড়ে চললো। খাওয়া নাওয়ার চেয়ে শরণার্থী ক্যাম্প্স থেকে বস্তি, বস্তি থেকে আর্মীর ক্যাম্প্স, সেখান থেকে খেলাধুলা করেই যা'ছিল দিনগুলো।

ক্যাম্প্সের পাশের বস্তির একটি বাড়ির পুকুরে সাঁতারকাটার জন্য গিয়ে পুকুরপাড়ের পিয়ারা গাছ থেকে পেয়ারা খেতে গিয়ে মালিকের হাতে ধরা পরেছি সে লজ্জা আজও ভুলতে পারছি না। ক্যাম্প্সে আমাদের রেশন হিসেবে নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসই দিতো। একবার আমার বন্ধুদের কথায় বাবা-মাকে না জানিয়ে তাদের সাথে পাশের জঙ্গলে চলে যাই রান্নার জন্য লাকড়ি সংগ্রহ করতে। ভেবেছিলাম বাবা-মা হয়তো খুশি হবেন লাকড়ি দেখে। সকালে ঘর থেকে পাহাড়ের ভিতরে হাঁটতে হাঁটতে গহীন জঙ্গলে চলে যাই, লাকড়ি সংগ্রহ করে ফিরতে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে যায়। এদিকে সারাদিন আমি ঘরে না ফেরাতে বাবা-মা দুঃচিন্তায় পরে গিয়েছিলেন, সন্ধ্যায় যখন মাথায় এক মুট লাকড়ি নিয়ে ঘরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে বাবা আমাকে এমন মার দিয়েছিলেন যা চার দিন জ্বর নিয়ে ঘরে থাকতে হয়েছে।

আমাদের ক্যাম্প্সে যদিও বিভিন্ন রকমের রোগব্যাধি কম হয়েছিল মৃত্যুর সংখ্যা ছিল কম কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী ক্যাম্প্সগুলোতে রোগব্যধির কারণে অগণিত মানুষের মৃত্যুবরণ করতে শোনা গেছে। কোন কোন ক্যাম্প্সে প্রতিদিন সেখানে ডাইরিয়া, আমাশয়সহ বিভিন্নরকমের অসুখে মানুষের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যেত।

ভারতে তখন আমাদের পরিচয় ছিল জয়বাংলার লোক হিসেবে। আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বাস কিংবা ট্রেনে কোথাও গেলে টিকিট কিংবা ভাড়া লাগতো না। জয় বাংলার লোকদের জন্য ফ্রি, বরং অনেকেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিত।

শ্রীনাথপুর শরণার্থী ক্যাম্প্সে বাংলাদেশের মানুষের দুঃসময়েও বড়রা প্রতি সপ্তাহে দু'দিন সকালে অনুষ্ঠিত হতো শিশু কিশোরদের জন্য অনুষ্ঠান, সেখানে চলতো মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গান, নাটক আর নতুন জাতীয় সঙ্গীতের সুর। সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অর্থ সাহায্য করা হত। আমরা শিশু-কিশোররা বড়দের গলার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গেয়েছি "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি/ চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস/ আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।/ ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,/ মরি হায়, হায় রে/ ওমা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে, আমি কি দেখেছি মধুর হাসি ॥....." । খেলনা পিস্তল নিয়ে আমরা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলেছি। আমাদের ক্যাম্প্সে দুর্গা পুজাসহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাটক হতে দেখেছি।

বাবার সঙ্গে হয়ে প্রতি সপ্তাহে যেতাম রেশন তুলতে। রেশনের মধ্যে থাকতো চাল-ডাল-তৈল- পেঁয়াজ-মশলাপাতির গুঁড়ো, কেরোশিন, দিয়াশলাই, কম্বল, কাপড় ধোয়ার সাবান, ঔষধ, নগদ অর্থসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় আর কত কি! কত সপ্তাহ গেছে মাংসতো চোখে দেখেইনি, মাছও ভাগ্যে জুটতো না। প্রায় প্রতি দিনই হতো খিচুরী অথবা আলু সিদ্ধ নয়তো ডালভাত। কতদিন ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পেয়েছি। আমি ছিলাম এক পেঠুক শিশু। বাড়িতে মুড়ির লাড্ডু থেকে সন্দেশ, দুধের সর সবই আমি খেয়ে ফেলতাম ফলে ক্যাম্পের সেই ক্ষুধার জ্বালায় রাগ হতো ভীষণ, কিন্তু করার কিছুই ছিলো না। বাবা-মার বিধ্বস্ত বিষন্ন ভরা কর"ণ দৃষ্টিই বুঝে নিতাম, তাঁরা অসহায়।

আমাদের ক্যাম্পের পাশেই ছোট একটি গ্রাম্য বাজার ছিল। বলতে গেলে শ্রীনাথপুর ক্যাম্পের মধ্যখানে। হাজার হাজার শরণার্থী ভরপুর এই ক্যাম্পের প্রতিদিন বাজার লোকসমাগমে গরম হয়ে উঠতো। সেখানে আমি প্রায়ই যেতাম। কখনো বাবার সঙ্গে আবার কখনো বন্ধুদের সঙ্গে। আমার মনে হয় সেই বাজারের সব দোকানেই রেডিও ছিলো আর সবাই রেডিওগুলো হাই ভলিয়মে চালাতো। প্রথমে বুঝতে পারিনি কী জন্যে ওরা এরকম করছে আর প্রতিটি দোকানেই একই স্টেশনের অনুষ্ঠান চলতো। একদিন বাবাকে জিজ্ঞেস করতেই বললেন সবাই বাংলাদেশের যুদ্ধের খবর জানতে চায় ফলে সবাই আকাশ বাণী কলকতা কিংবা কখনো বিবিসির সংবাদ বাজায়। সে সময়ে আকাশ বাণীর সংবাদ ও সংবাদ পর্যালোচনা পড়তেন নীলীমা সন্যাল ও দেবদুলাল বন্ধ্যোপধ্যায়। কী অদ্ভুত সুন্দর হৃদয় নিংরানো স্পর্শকাতর সংবাদ পর্যালোচনা পড়তেন। এমন সংবাদ পর্যালোচনা শুনে বড়দের চোখ দিয়ে অপ্রতিরোধ্য অশ্র" ঝড়ে পড়তে দেখতাম। তঁর সংবাদ পর্য়ালোচনার কথা আমি আমৃত্যু ভুলতে পারবো না। সেই শৈশবের শোনা বাংলাদেশের যুদ্ধের ওপর মর্মস্পর্শী সংবাদ পর্যালোচনা আজ তেত্রিশ বছর পরও একটু ভুলতে পারিনি, বরং আমাকে বার বার নিয়ে যায় একাত্তরের সেই দুঃসহ দিনগুলোর মাঝে।

না আমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম না, একাত্তরের ভয়াবহ দিনগুলো ছিলো আমার একান্ই শৈশব। তারপরে দেখেছি যুদ্ধের বীভৎসতা, শুনেছি নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের দীর্ঘাহিত সারি, দেখেছি মানবতার পদপৃষ্টতা, দেখেছি ধ্বংসযজ্ঞের নির্মমতা।

শরণার্থী ক্যাম্প থেকে ফিরে দেখি সম্পূর্ণ বাড়িটি একটি ধ্বংসস্তুপ। বাড়ির অস্থাবর সম্পত্তি বলতে কিছুই ছিলো না। বাড়ির পাকা ঘর ভেঙ্গে রড ও নিতে ভুল করেনি ঘাতক হায়েনারা। বাড়ির গাছ-বাঁশ কেটে সবই নিয়ে গিয়েছিলো। বাড়িটি ছিল দেখতে একটি শ্মশানভুমি। তারপরেও সবাই আনন্দিত ছিলো নতুন বাংলাদেশে। জয় বাংলার জয়ে।

মন্ট্রিয়ল/ ২৩.৬.২০০৪